আটকে আছে ১৯টি ল্যান্ডফোন কোম্পানির ৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ

■ ৪২ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি ■ ঘুষ ১০ কোটি

X ফাইল

বিটিআরসি

রিপোর্ট **বদরুল আলম নাবিল**

সরকারি সংস্থা টিএন্ডটি বোর্ড দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিফোন চাহিদা পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় দাতা এবং দেশের জনমতের চাপে ল্যান্ডফোন ব্যবসায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স প্রদান, ফ্রিকোয়েন্সি (তরঙ্গ) বন্টন এবং কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই বর্তায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) নামের স্বাধীন কমিশনটির ওপর। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে বিটিআরসি ওপেন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে আগ্রহী কোম্পানিগুলোকে ল্যান্ডফোন ব্যবসার লাইসেন্স দিতে শুরু করে। লাইসেন্সের জন্য বিটিআরসি পুরো দেশকে ৫টি জোনে ভাগ করে। এর মধ্যে ঢাকা সিটি জোন ছাড়া বাকি ৪টি জোনের জন্য এ পর্যন্ত ১০টি কোম্পানিকে ২১টি লাইসেন্স দিয়েছে (প্রত্যেক জোনের জন্য আলাদা লাইসেন্স নিতে হয়)। আরো ৯টি কোম্পানির লাইসেন্স অনুমোদন হয়ে আছে।

উল্লেখ্য, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৯টি কোম্পানির সব ক'টিই দেশী। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার শুরুতেই কোম্পানিগুলো পশ্চিমা দেশগুলোতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা প্রবাসী টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আসে উচ্চ বেতন-ভাতা দিয়ে। যেমন র‍্যাংগস টেলিকম প্রকৌশলী জাকারিয়া স্বপন, বাংলাফোন প্রকৌশলী আমজাদ খান, টেলিবার্তা প্রকৌশলী মাহমুদের মতো সফল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে টিম গঠন করে। প্রকৌশলী আমজাদ খানের নিজের ফোনের ব্যবসা আছে আমেরিকায়। সেখানে উপার্জিত পুঁজি নিয়ে এখানে এসেছেন ব্যবসা করতে। লাইসেন্স নেয়া ১০টি কোম্পানির মধ্যে কমপক্ষে ৬টি কোম্পানি ইতিমধ্যে দেশী এবং প্রবাসী টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সদস্যের টিম গঠন করেছে। প্রতিটি কোম্পানি ৬ লাখ টাকা দরখাস্ত ফি জমা দিয়ে প্রথমে আবেদন করে। এরপর প্রত্যেক কোম্পানি প্রতিটি জোনের লাইসেন্সের জন্য লাইসেন্সের জন্য বিটিআরসিকে ২ কোটি টাকা এবং ৫ কোটি টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়েছে।

এর পরে আসে উৎকোচের পালা।

গুলশানের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বাড়ির ৪টি বড় ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়েছে অফিসের জন্য। বিটিআরসি যদি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো অবদান না রাখতে পারে, তবে শত শত কোটি টাকা দিয়ে তাদের পালন করে লাভ কি? বিটিআরসির চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন, এটা নামে স্বাধীন কমিশন হলেও সরকারের গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না

বিভিন্ন সূত্র থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিটিআরসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদের কাছের মানুষ সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যানের জন্য লাইসেন্স প্রতি ৪০ লাখ টাকা নিয়েছে। আরো ২০ লাখ করে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির আরেক কমিশনার (লিগ্যাল এবং লাইসেন্স) আবু বকর। চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ এরকম অর্থ নেয়ার দু-একটি অভিযোগ পেয়েছেন বলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে স্বীকার করেছেন। তবে তিনি অঙ্কটা আরো অনেক কম বলে দাবি করেন। অন্যদিকে কমিশনার আবু বকর অভিযোগ সন্ত্রস্ত কণ্ঠে অস্বীকার করেছেন।

সে যাই হোক, অনুমোদিত ১৯টি কোম্পানির প্রত্যেকে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তাতে এক বছরেই এই কোম্পানিগুলো প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতো এখাতে। কিন্তু বিটিআরসি'র অদক্ষতার কারণে আটকে আছে পুরো প্রক্রিয়াটি। অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘসূত্রিতার কারণে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পরেছেন উদ্যোক্তারা। গত জুন মাসে লাইসেন্স পাওয়া কোম্পানিগুলো ঘোষণা দিয়েছিল চলতি ডিসেম্বরে তারা সংযোগ দেয়া শুরু করবে। বিটিআরসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদও একই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি এখন পর্যন্ত কোম্পানিগুলোকে ফ্রিকোয়েন্সি এবং এক্সেস কোড বরাদ্দ দিতে পারেননি বিটিআরসি। ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে অদ্যাবধি আসতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

বিটিআরসির বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, দেশের শীর্ষ একটি গ্রুপ অব কোম্পানি ল্যান্ডফোন ব্যবসার জন্য লাইসেন্স নিয়েছে। এই কোম্পানিটির টেলিফোন ব্যবসায় আবার যুক্ত হয়েছেন বর্তমানে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান পরিবারের একজন সদস্য। ওনারা চাচ্ছেন ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে এককভাবে এই কোম্পানিটিই শুধু ল্যান্ডফোনের ব্যবসা করুক। বিটিআরসিকে শুধু ঐ কোম্পানিটির ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দেয়ার জন্য উচ্চমহল থেকে বারবার চাপ দেয়া হচ্ছে বলে বেশ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে।

এক হিসাবে দেখা যায়, ২১টি লাইসেন্স দিতে এ পর্যন্ত ১০টি কোম্পানির কাছ থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা উৎকোচ নিয়েছে বিটিআরসির কর্মকর্তারা। কোম্পানিগুলো বলছে, বাংলাদেশে এখন উৎকোচ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। সেটা জেনেই আমরা বাধ্য হয়ে উৎকোচ দিয়েছি। এরপরও যদি বিটিআরসি ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দিয়ে আমাদের অপারেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতো তাহলে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু উৎকোচ নেয়ার পরও

'কমিশনে দক্ষ লোকের অভাবে আমি ব্যর্থ হয়েছি'

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ডিসেম্বরে বেসরকারি ল্যান্ডফোন সংযোগ দেয়া শুরু হবে। ডিসেম্বর চলছে, আপনার মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ এখনো আপনি কোম্পানিগুলোকে ফ্রিকোয়েন্সি ও এক্সেস কোড দিতে পারেননি।

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ : ফ্রিকোয়েন্সি বন্টনের কোনো নীতিমালা আমাদের দেশে নেই। আমরা একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছি, এটি সম্পন্ন হলে এ সমস্যার সমাধান হবে। যদিও বলা হয় স্বাধীন কমিশন কিন্তু আমরা আসলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারিনি। প্রায় সব কাজে মন্ত্রণালয়ের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট লাগে। তারপর উপর মহল থেকে চাপ এবং তদবির তো আছেই। এছাড়া কমিশনে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকের অভাব। টেলিযোগাযোগ কমিশন চালাতে যে রকম টেকনিক্যালি সাউন্ড লোকবল দরকার তা আমাদের দেশে নেই। এসব কারণেই আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি স্বীকার করছি আমি ব্যর্থ।

২০০০ : আপনি কত দিনের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি দিতে পারবেন?

মার্গুব মোর্শেদ : খুব শিগ্রই পারব আশা করি।

২০০০ : আপনি ফ্রিকোয়েন্সি সংকটের কথা বলছেন কিন্তু একসঙ্গে ১৯টি কোম্পানিকে লাইসেন্স দিলেন কেন?

মার্গুব মোর্শেদ : যারা এসেছে আমরা সবাইকে লাইসেন্স দিয়েছি। কাউকে ফিরাইনি। কাউকে বাদ দিতে হলে যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষা-নরীক্ষা করতে হয় সে রকম জনবল আমার কাছে নেই বলেই আমি সবাইকে লাইসেন্স দিয়েছি। এরপর প্রতিযোগিতায় যে টিকে থাকার থাকবে যে পারবে না হারিয়ে যাবে।

২০০০ : কিন্তু অভিযোগ আছে,উৎকোচের টাকার জন্য আপনারা যে আসছে তাকেই লাইসেন্স দিয়েছেন। সাইফুলইসলাম নামে একজনকে দিয়ে প্রত্যেক লাইসেন্সের বিপরীতে আপনিও ৩০ থেকে ৪০ লাখ করে নিয়েছেন এবং আরেক কমিশনার আবু বকর আরো ২০ লাখ করে নিয়েছেন।

মার্গুব মোর্শেদ : সাইফুল এখানে চাকরি করে না। সে আমার পরিচিত। আমি কাউকে দিয়ে টাকা নেইনি। দেশে আমার পর্যায়ের মানুষের মধ্যে অর্থিক দিয়ে যে ক'জন সৎ আছেন আমি তাদের মধ্যে এ নম্বরে। আমি দু-একটি অভিযোগ পেয়েছি সাইফুল এবং আরো একজন কিছু টাকা নিয়েছে। কিন্তু অঙ্কটা এত বেশি হবে না। সাইফুল হয়তো টাউট ফি নিয়েছে। যদি কেউ এসে প্রমাণসহ বলে আমার কথা বলে কেউ টাকা নিয়েছে। আমি তার টাকা বাড়ি পৌঁছে দেব।

২০০০ : ভিওআইপি বৈধ করার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এখনো তা কার্যকর হয়নি কেন?

মার্গুব মোর্শেদ : আমি ৩ বছর ধরে যুদ্ধ করছি ভিওআইপি বৈধ করার জন্য। এতে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ত। অবৈধভাবে ভিওআইপি'র যে ব্যবসা চলছে তা থেকে রাজস্ব সরকার পাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু এখনো তা কার্যকর হয়নি।

২০০০ : বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য কয়েকজন চেষ্টা করছেন কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রগতি আছে কি?

মার্গুব মোর্শেদ : বৈশাখী, রূপসী বাংলা ববং ওটিভি নামে কয়েকটি চ্যানেল লাইসেন্সের জন্য এসেছিল, আমি তাদের বলেছি তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন, আমি ৭ দিনের মধ্যে লাইসেন্স দিয়ে দেব।

আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চাইলেও তা স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে আটকে আছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যারা বিদেশে চাকরি অথবা ব্যবসা করে কষ্টের টাকা এখানে বিনিয়োগ করতে ফিরে এসেছেন। এসব প্রবাসী বিনিয়োগকারী এই ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তায় ফেডাপ হয়ে উঠেছেন

তারা কাজ করছে না। লাইসেন্স দেয়ার জন্য টাকা, ফ্রিকোয়েন্সি দেয়ার সময় আবার টাকা চাইবে তারপর এক্সেস কোডের জন্য আরেক দফা টাকা চাইবে।

লাইসেন্স দেয়ার পর ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি বন্টন করা হচ্ছে না কেন? প্রশ্নের উত্তর বিটিআরসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ ২০০০কে বলেন, 'ফ্রিকোয়েন্সি হলো একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ। পুরো পৃথিবীতেই ফ্রিকোয়েন্সি সীমিত। ইচ্ছে করলেই ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো যায় না। আমাদের দেশে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি বন্টন পলিসি নেই। ফলে অতীতে একটি মোবাইল কোম্পানিকে অত্যধিক ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ কোম্পানিটি তার যৎসামান্যই ব্যবহার করতে পেরেছে। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় এবং কোম্পানিটির মালিকপক্ষ ক্ষমতাবান হওয়ায় আমরা তাদের কাছে বরাদ্দ দেয়া অতিরিক্ত ফ্রিকোয়েন্সি এখনো ফেরত আনতে পারিনি।'

উল্লেখ্য, কোম্পানিটি তাদের নামে বরাদ্দ ২০ মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে বছরে মাত্র আড়াই মেগাহার্টজ ব্যবহার করতে পেরেছে। মার্গুব মোর্শেদ বলেন, 'যে অবশিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে তার বেশির ভাগ কমিশনের কোনো কোনো কমিশনার বিটিটিবিকে দিয়ে দেয়ার পক্ষে, যা বিটিটিবি পুরোটা ব্যবহার করতে পারবে না। এ কারণেও আমি কোম্পানিগুলোকে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দিতে ব্যর্থ হয়েছি।' অন্যদিকে কোম্পানিগুলো বলছে, 'আইন অনুযায়ী এই অব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সি ফেরত আনার সম্পূর্ণ এখতিয়ার বিটিআরসির রয়েছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তা তারা করছে না।'

ফ্রিকোয়েন্সি কি

ফ্রিকোয়েন্সি শব্দের বাংলা হচ্ছে তরঙ্গ। পৃথিবীতে টেলি-যোগাযোগ হয় দুটি পদ্ধতিতে। একটি তারের মাধ্যমে, যেভাবে বিটিটিবি ল্যান্ডফোন সংযোগ দিচ্ছে। দ্বিতীয়টি তারবিহীন তরঙ্গের (ওয়ারলেস লোকাল লুপ) মাধ্যমে। ক্যাবলের চেয়ে ওয়ারলেস প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিসংযোগ অনেকগুণ বেশি সাশ্রয়ী। এ প্রযুক্তিতে যত্রতত্র এক্সচেঞ্জ ও সুইচিং স্টেশন বসাতে হয় না। মোবাইল কোম্পানিগুলোর মতো স্বল্প খরচে টাওয়ার বসিয়ে বিরাট এলাকা কভার করা সম্ভব। কিন্তু এই ওয়ারলেস প্রযুক্তিতে টেলিসংযোগের জন্য ফ্রিকোয়েন্সির দরকার হয়। এই ফ্রিকোয়েন্সি সারা পৃথিবীতেই সীমিত, যা চাইলেই মানুষের পক্ষে বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু অতীতে একটি কোম্পানিকে মাত্রাতিরিক্ত ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে রাখা হয়েছে, যা দিয়ে কোটি কোটি ফোন সংযোগ দেয়া সম্ভব। এর এক-দশমাংশও তারা ব্যবহার করতে পারেনি। ফলে ফ্রিকোয়েন্সির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিটিআরসি উল্লিখিত বেসরকারি ল্যান্ডফোন কোম্পানিগুলোকে ফ্রিকোয়েন্সি দিতে পারছে না। ফলে অর্ধবছরের বেশি সময় লাইসেন্স, জনবল, অর্থ এবং টেকনোলজি নিয়ে বসে আছে কোম্পানিগুলো; অপারেশনে যেতে পারছে না। লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা কোম্পানিগুলোর প্রত্যেকেই এই ল্যান্ডফোন খাতে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার লক্ষ্য নিয়ে এসেছে। টাটা ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লোভ দেখিয়েছে, যা নিয়ে সরকার হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। অথচ আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চাইলেও তা স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে আটকে আছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যারা বিদেশে চাকরি অথবা ব্যবসা করে কষ্টের টাকা এখানে বিনিয়োগ করতে ফিরে এসেছেন। এসব প্রবাসী বিনিয়োগকারী এই ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তায় ফেডাপ হয়ে উঠেছেন। কোম্পানি গঠন করে লোকজন নিয়োগ দিয়েছেন, অফিস নিয়েছেন, এখন ফেরতও যেতে পারছেন না। এরকম দু'জন প্রবাসী বিনিয়োগকারী ২০০০কে বলেছেন, এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে জানলে এখানে বিনিয়োগ করতে আসতাম না।

চাইলেই পাবেন লাইসেন্স

বিটিআরসি বলছে, ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যাচ্ছে না বলে এখনো বন্টন করা সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সির এতটা

ঢাকার লাইসেন্স

বিটিআরসি ল্যান্ডফোনের জন্য মোট ১৯টি কোম্পানিকে দেশের বিভিন্ন জোনে লাইসেন্স প্রদান করলেও ঢাকা শহরের জন্য এখন পর্যন্ত কাউকে লাইসেন্স দেয়নি। গত সরকারের সময় ওয়ার্ল্ডটেল নামের একটি কোম্পানিকে এককভাবে (মনোপলি) ঢাকা শহরের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল এবং সেটা এই সরকারের আমলে দুর্নীতি সংক্রান্ত স্বেতপত্রে স্থান পেয়েছে। বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম টাকার বিনিময়ে এই কাজটি করে গেছেন। এখন সেই ওয়ার্ল্ডটেল নামের কোম্পানিটি কোর্টে মামলা করে রেখেছে, যেন তারা তাদের অধিকার ফিরে পায়। কিন্তু দেশের আইন অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানকে মনোপলি দেয়ার নীতি নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, ওয়ার্ল্ডটেল নামের সেই কোম্পানিটির পৃথিবীর কোথাও কোনো টেলিফোন নেটওয়ার্ক নেই। তারা মূলত কাগুজে কোম্পানি।

এদিকে মোবাইল কোম্পানিগুলো পুরো দেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করতে পারলেও এই ল্যান্ডফোন কোম্পানিগুলো ঢাকা শহরে অপারেট করতে পারবে না। কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষেরই ফোনের প্রয়োজন বেশি। বিটিআরসি তেমন কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি, যাতে সেই মামলা কাটিয়ে উঠে দেশের মানুষ টেলিফোন সেবা পেতে পারে।

সংকট থাকা সত্ত্বেও একত্রে কেন ১৯টি কোম্পানিকে অনুমোদন দেয়া হলো? বিটিআরসির চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ এবং কমিশনার (লাইসেন্স) আবু বকর ২০০০কে বলেছেন, 'যে কোম্পানি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করেছে আমরা তাদেরই লাইসেন্স দিয়েছি। কাউকে ফেরাইনি।'

ভুক্তভোগী কোম্পানিগুলো বলছে, উৎকোচের লোভেই বিটিআরসি যে লাইসেন্স চেয়েছে তাকেই দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে শর্ত অনুযায়ী কোম্পানিটির দক্ষ লোকবল আছে কি না তা বিবেচনা করা হয়নি। ১৯টি কোম্পানির মধ্যে মাত্র ৬টি কোম্পানির দক্ষ লোকবল আছে বাকিগুলোর নেই। কিন্তু তারাও লাইসেন্স পেয়েছে। যেমন সাকা চৌধুরীর কিসি টেলিকমিউনিকেশন, জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর কেয়ারি টেলিকম, আব্দুল আউয়াল মিন্টুর এম টেল, আনিসুর রহমান সিনহার পিপলস টেলিকমের মতো কোম্পানিগুলোও যাদের এরকম টেলিফোন কোম্পানি চালানোর মতো একজন টেকনিক্যাল লোকও নেই তারাও অনুমোদিত হয়েছে।

ভুক্তভোগী কোম্পানিগুলোর বক্তব্য, 'চাহিবামাত্র লাইসেন্স দেয়া হবে', এটাই যদি নিয়ম হয় তবে বিটিআরসির দরকার কী? বিটিআরসির কাজই হলো এই শিল্পকে রেগুলেট করা। যেন এখানে বিনিয়োগ হয় এবং বিনিয়োগকারী যাতে তার বিনিয়োগ ফেরত নিতে পারেন সেরকম পরিবেশ তৈরি করা। বিটিআরসির উচিত ছিল প্রথমে ২-৩টি লাইসেন্স দিয়ে অবস্থা দেখে নতুন লাইসেন্স দেয়া। তা না করায় এখন লাইসেন্সপ্রাপ্তদের অনেকেই লাইসেন্স বিক্রি করার চেষ্টা করছেন।

এক্সেস কোড নিয়ে জটিলতা

বাংলাদেশের ৪টি মোবাইল কোম্পানিকে একটি করে আলাদা এক্সেস কোড দেয়া হয়েছে। যেমন সিটিসেলের ০১১ এবং গ্রামীণের ০১৭ ইত্যাদি। কিন্তু বিটিআরসি ৬ মাসেও ল্যান্ডফোন কোম্পানিকে এক্সেস কোড দিতে পারেনি। কোম্পানিগুলো ০২১, ০২২, ০২৩ ইত্যাদি এক্সেস কোড প্রস্তাবনা করেছিল। কিন্তু বিটিআরসির কমিশনার (ERO) এম রেজাউল হক তা না মেনে একেকটি কোম্পানিকে একেক জেলায় টিএন্ডটি এক্সেস কোডের অধীনে একেক ধরনের এক্সেস কোড দেয়ার পাঁয়তারা করছেন। এতে কোন কোম্পানির কোন ফোন তা চিহ্নিত করা যেমন কঠিন হবে, তেমনি এতে কোম্পানিগুলোর স্টাবলিস্টমেন্ট ও অপারেশন কস্ট অনেক বেড়ে যাবে। কারণ সে ক্ষেত্রে শুধু টাওয়ার বসিয়ে কোম্পানিগুলো লাইন সংযোগ দিতে পারবে না। সর্বত্র আবার সুইচিং স্টেশন বসাতে হবে।

টেকনোলজি যেখানে ক্রমশ সিম্পল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তিনি বিষয়টি আরো জটিল করে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন। অভিযোগ আছে, এই প্রযুক্তি জ্ঞানশূন্য লোকটির খামখেয়ালিপনার জন্যই আটকে আছে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ এবং এক্সেস কোড।

দ্বিতীয়টি তারবিহীন তরঙ্গের (ওয়ারলেস লোকাল লুপ) মাধ্যমে। ক্যাবলের চেয়ে ওয়ারলেস প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিসংযোগ অনেকগুণ বেশি সাশ্রয়ী। এ প্রযুক্তিতে যত্রতত্র এক্সচেঞ্জ ও সুইচিং স্টেশন বসাতে হয় না। মোবাইল কোম্পানিগুলোর মতো স্বল্প খরচে টাওয়ার বসিয়ে বিরাট এলাকা কভার করা সম্ভব

ইন্টার কানেকটিভিটি

বাংলাদেশে প্রতিটি ফোন কোম্পানিকে কার্যক্রম চালাতে হয় বিটিআরসির লাইসেন্স নিয়ে। সেখানে পরিষ্কার করা লেখা আছে, প্রতিটি কোম্পানি আরেকটি কোম্পানিকে ইন্টার কানেকটিভিটি দিতে বাধ্য। ইন্টারকানেকটিভিটির ফলে এক কোম্পানির গ্রাহক আরেক কোম্পানির গ্রাহককে কল করতে পারেন। যেমন- গ্রামীণফোনের একজন গ্রাহক যদি একটেলের একজন গ্রাহককে ফোন করতে চান, তাহলে তখনই এটা সম্ভব যদি গ্রামীণফোন ও একটেলের মধ্যে ইন্টারকানেকটিভিটি থাকে। এটা দুই পক্ষকে মিলে করতে হয়।

বর্তমান মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো একযোগে নতুন এই ল্যান্ডফোন কোম্পানিগুলোকে ইন্টারকানেকটিভিটি দিতে অপারগতা জানিয়েছে। ফলে নতুন এই ফোনের গ্রাহকরা মোবাইল ফোনের গ্রাহকদের ফোন করতে পারবে না। আবার উল্টোটিও ঠিক।

জানা গেছে, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো টাকা দিয়ে বিটিআরসিকে অকার্যকর করে রেখেছে। তা না হলে বিটিআরসি কেন কোনো ভূমিকা নেবে না? কোটি কোটি টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিয়ে কোম্পানিগুলো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিটিআরসি নীরব। ল্যান্ডফোন লাইসেন্স নেয়া কোম্পানি বসুন্ধরা, র‍্যাগস্, টেলিবার্তা এবং বাংলা ফোনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তাদের পরিকল্পনা প্রতিটি সংযোগের জন্য তারা ২ থেকে ৩ হাজার টাকা করে নেবেন। এবং কলচার্জ হবে মিনিটে ৫০ পয়সা। তারা আরো বলেছেন ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার ২ মাসের মধ্যে তারা সংযোগ দিতে শুরু করবেন।

কর্মকর্তাদের যোগ্যতা

বিটিআরসির ৫ কমিশনার এখন ব্যস্ত তাদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য। বেশির ভাগ কর্মকর্তার চাকরির ৩ বছরের মেয়াদ এ বছরের ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাবে। আবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ না পেলে তাদের টাকা বানানোর যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সবাই জরুরি কাজ ফেলে তদবির নিয়ে ব্যস্ত। তারা ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রিয় লোকদের দরজা থেকে দরজায়।

এখানে বলে রাখা দরকার, বিটিআরসির প্রায় সব কর্মকর্তাই সরকারি অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং তাদের বয়সও আর চাকিরযোগ্য নেই। তারা শারীরিকভাবে অক্ষম। আর তাদের টেকনিক্যাল যোগ্যতা তো হাস্যকর পর্যায়ে পড়ে। টেলিযোগাযোগ সম্পর্কে তাদের সামান্য জ্ঞান আছে কি না সে ব্যাপারে সবারই সন্দেহ রয়েছে।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন, তার লোকজন ততটা দক্ষ নয় বলেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। টিএন্ডটি বোর্ড থেকে অবসর নেয়া কয়েকজন অযোগ্য লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল কমিশন। ৩ বছরের মাথায় তারা ব্যর্থতার ষোলোকলা পূর্ণ

করেছেন। তবে নিজেদের পকেট ভরেছেন। বিটিআরসিতে ৫ জন কমিশনার, ৪ জন পরিচালকসহ স্থায়ী জনবল ৩৬ জন। এছাড়া অস্থায়ী আছেন আরো ১৫-২০ জন। গুলশানের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বাড়ির ৪টি বড় ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়েছে অফিসের জন্য। বিটিআরসি যদি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো অবদান না রাখতে পারে, তবে শত শত কোটি টাকা দিয়ে তাদের পালন করে লাভ কি? বিটিআরসির চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন, এটা নামে স্বাধীন কমিশন হলেও সরকারের গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। অথচ বিটিআরসি আইনে বলা আছে, এটি স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং এখানে চেয়ারম্যানসহ অন্য কর্মকর্তাদের সরকার চাইলেই চাকরিচ্যুত করতে পারবে না। চাকরিচ্যুত করতে হলে সংসদের অনুমোদন লাগবে অথবা ঐ কর্মকর্তাকে কোর্ট কর্তৃক পাগল ঘোষণা করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারের অযাচিত খবরদারি তো আছেই, তারপরও বিটিআরসির কর্মকর্তাগণ দক্ষ নন বলেই আইনে সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও সরকারি হস্তক্ষেপ এরাতে পারেননি। আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, বিটিআরসির সব

টেকনোলজি যেখানে ক্রমশ সিম্পল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তিনি বিষয়টি আরো জটিল করে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন। অভিযোগ আছে, এই প্রযুক্তি জ্ঞানশূন্য লোকটির খামখেয়ালিপনার জন্যই আটকে আছে ফিকোয়েন্সি বরাদ্দ এবং এক্সেস কোড

কর্মকর্তা বছরের দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে থাকেন। অনেকে অসুস্থ থাকলেও বিদেশ ভ্রমণ বাতিল করেন না। তারা নিজেদের খরচে বা সরকারের খরচে বাইরে যান না। ফোন কোম্পানিগুলের সাপ্লায়ার্সরা তাদের ঘুষ হিসেবে দেশের বাইরে নিয়ে যায়। কখনও সেমিনারের নামে, কখনও কোম্পানি পরিদর্শনের নামে। তাদের অফিসে পাওয়াই মুশকিল। মানুষ রসিকতা করে বলে, বিটিআরসি তো তৈরি হয়েছে ভেন্ডারদের স্বার্থ মেটাতে। তারা কে কখন কোথায় বেড়াতে যাবেন, সেই হিসাব মেটাতেই ব্যস্ত। কাজ করবেন কখন?

কিন্তু এখন এই নতুন লাইসেন্সধারী কোম্পানিগুলোর কী হবে? কোটি কোটি টাকা ছয় মাস ধরে দিয়ে রেখে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন পার করছে। কবে এই জট খুলবে কেউ জানে না।

একটি ফোন দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে বিশাল প্রভাব ফেলে। এটা পৃথিবীর সব অর্থনীতির জন্যই প্রযোজ্য। তার ওপর দেশে আগামী বছর আসবে সাবমেরিন ক্যাবল। ল্যান্ডফোন ছাড়া সেই ক্যাবলের ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব নয়। সাবমেরিন ক্যাবল বাংলাদেশে নতুন দিনের সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। কিন্তু এই ল্যান্ডফোন ছাড়া সেই সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। তারা ছাড়া এই ল্যান্ডফোন কোম্পানিগুলোর সব কটি অপারেশনে গেলে প্রত্যক্ষভাবে ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন আরো হাজার হাজার মানুষ। এখন সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে কোম্পানিগুলো। তারা আসা করছেন, এই অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ কমিশন পুনর্গঠন করে দক্ষ কমিশন গড়ে তুলবে সরকার।

ছবি : **খালেদ সরকার**